মনটাকে কাজ দিন

অধ্যাপক গোলাম আযম

ভূমিকা

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৬ সেল নামক ১২ কামরাবিশিষ্ট দীর্ঘ দালানের এক নম্বর কামরায় আমি ১৬ মাসের জেলজীবন কাটাই। দিনের বেলা আমার কামরার সামনে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে একজন সিপাই সব সময় ডিউটিতে থাকত। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পালাক্রমে দুজন সিপাই ৬ ঘণ্টা করে অবস্থান করত। রাতেও তাদেরকে ৩ ঘণ্টা করে ডিউটি করতে হতো।

দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা সময় তাদের যেভাবে কাটত তা দেখে আমার মায়াই লাগত। কখনো একটু পায়চারি করে, কোনো সময় বারান্দার লোহার সিক ধরে দাঁড়িয়ে, এক সময় দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাঝে মাঝে বসে একটু ঝিমিয়ে কোনো রকমে সময়টা পার করতে হতো। ২৬ সেলের চাবির ছড়া হাতে ডিউটিরত অপর একজন সিপাইর সাথে গেটের সিঁড়িতে বসে আলাপ করাকালে তার সময়টা ভালোই কাটত বলে মনে হয়। আমি আলাপ করলে সে খুব খুশি হতো।

ঐ এলাকার জমাদারকে এ দুজন সিপাইর সাথে গল্পরত অবস্থায় দেখলে আমি কয়েকজনকে একসাথে পেয়ে জিজ্ঞেস করতাম, আপনারা ডিউটিতে থাকাকালে শরীরটা তো দাঁড়িয়ে, বসে বা হেঁটে সময় কাটায়; কিন্তু মনটা এ সময় কোথায় থাকে এবং কী করে? প্রশ্ন শুনে একে অপরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে আমার দিকে অসহায় চোখে তাকালে আবার ঐ প্রশ্নই করতাম। তখন একটু ভেবে তারা পাল্টা প্রশ্ন করত, মনে হাজারো চিন্তা-ভাবনা তোলপাড় করতে থাকে– পারিবারিক বিষয়, চাকরিতে সমস্যা, অভাব-অনটন নিয়ে দুশ্চিন্তা, আজেবাজে কত কথা যে মনে জাগে, এর কি কোনো হিসাব থাকে? আবার প্রশ্ন করতাম, আচ্ছা, এসব ভাবনা-চিন্তা কি নিজে নিজেই এসে ভিড় জমায়, না সচেতনভাবে একটা একটা করে বিষয় নিয়ে ভাবেন? একটু হেসে জবাব দিত, এর কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কখন যে কোন্ কথা মনে হাজির হয়ে যায়, তা টেরও পাওয়া যায় না।

প্রথমত, এদের কথা বিবেচনা করেই আমার মনে খেয়াল হলো যে, মনটাকে সচেতনভাবে কাজ না দিলে শয়তান সহজেই খালি মনটাকে দখল করে বসে। শুধু পুলিশ, সিপাই, দারোয়ানের বেলায়ই নয়, সবার ব্যাপারেই এ কথা সত্য। তাই মনটাকে কাজ দেওয়ার গুরুত্ব অনুভব করে এ পুস্তিকাটি রচনা করা হয়।

আমি জেলে থাকাকালেই এ লেখাটি মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ এর দ্বারা উপকৃত হবেন। আল্লাহ্ তাআলা এ লেখাটির উদ্দেশ্য সফল করুন।

গোলাম আযম
আগস্ট ১৯৯৩

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মনটাকে কাজ দিন

আপনার দেহকে শোয়া, বসা, দাঁড়ানো বা হাঁটা-চলা ইত্যাদি যে অবস্থায়ই রাখুন, সর্বাবস্থায়ই আপনার মন কাজ করতে থাকে। এমনকি দেহ যখন ঘুমে অচেতন থাকে তখনো মন কাজ করতে থাকে। কারণ, সে ঘুমায় না। মনোবিজ্ঞানীরা স্বপ্নকে মনের কর্মব্যস্ততা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। দেহ যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে, মন তখন আরো সক্রিয় হয়। সে ক্লান্তও হয় না, বিশ্রামও নেয় না।

মনোবিজ্ঞানীরা মনের বিশ্লেষণ এবং চেতন, অবচেতন ও অচেতন মনের ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যাপক চর্চা করেছেন। আমার আলোচ্য বিষয় তা নয়। আমরা সবাই এর ভুক্তভোগী যে, আমাদের সজাগ-সচেতন পরিকল্পনা ছাড়াই মনে হাজারো কথা জাগে। সুচিন্তা, কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা সব সময়ই মনে ভিড় করেই থাকে। গাড়িতে হোক আর বাড়িতেই হোক, চুপ করে হয়তো বসে আছেন; মন কিন্তু চুপ নয়। কত আজে-বাজে, খেইছাড়া, খেইহারা, অগণিত কথা সে বুনেই চলেছে। হাতে কাজ করছেন, আর আপনার বিনা ইচ্ছায় এমনসব কথা মনে জাগছে, যা হয়তো আপনি মন থেকে তাড়াতেই চান। শুদ্ধ উচ্চারণে নামাযে সূরা-কিরাআত পড়ছেন, আর মন কোথায় যে ছোটাছুটি করছে তার হিসাব নেই। কোনো কোনো সময় এমন সব খেয়াল মনে জাগে, যা বিবেকের নিকট লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায় — এ সবই আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

আমরা যখন মনোযোগ দিয়ে বই পড়ি তখন বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের বাইরের কোনো কথা মনে ঢোকারই ফাঁক পায় না। যখন একাগ্রচিত্তে কারো বক্তৃতা শুনি তখন অন্য কোনো ভাব মনে জাগে না। যখন কোনো কাজের পরিকল্পনা করতে বসি তখন ভিন্ন চিন্তা স্থান পায় না। কোনো বিষয়ে যখন গবেষণায় লিপ্ত হই তখনো বাইরের চিন্তা জাগার সুযোগ পায় না। কোনো বিশেষ ভাব যখন লিখে প্রকাশ করার চেষ্টা করি তখন ভিন্ন ভাব মনে কোনো পাত্তাই পায় না। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মনকে সচেতনভাবে কোনো কাজে ব্যস্ত রাখলে সে অনুগত হয়ে ঐ কাজ করতে থাকে; কিন্তু যখনই তাকে অবকাশ দেওয়া হয় তখনই সে নিজে কাজ জোগাড় করে নেয়। কারণ, সে কখনো অবসর থাকতে পারে না।

বিখ্যাত ইংরেজি প্রবাদ 'Empty mind is devil's workshop' (শূন্য মন শয়তানের কারখানা) কথাটি বড়ই তিক্ত সত্য। অর্থাৎ, মনকে কর্মহীন অবস্থায় রাখা হলে সে খালি থাকবে না। ইবলিস তাকে কাজ দেবেই। যেহেতু সে বিনা কাজে থাকতে পারে না, সেহেতু ইবলিসের দেওয়া কাজই সে করতে থাকে।

রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ এমন এক ঘোড়া, যার পিঠ কখনো খালি থাকে না। যদি সে সব সময় আল্লাহকে তার পিঠে সওয়ার করিয়ে রাখে তাহলে সে নিরাপদ। যখনই তার পিঠ খালি হয় তখনই ইবলিস চেপে বসে। তাই ইবলিস থেকে বেঁচে থাকতে হলে পিঠ কখনো খালি রাখা চলবে না। সর্বাবস্থায় সচেতনভাবে কথা, কাজ ও চিন্তায় আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকলে ইবলিস তার আনুগত্য করানোর সুযোগ পায় না।

আমরা যদি আমাদের মনকে শয়তানের কারখানা হওয়ার শোচনীয় পরিণাম থেকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে মনটাকে হামেশা কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে। আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সচেতনভাবে তাকে সব সময় কাজ দিতে থাকব। বিনা কাজে কোনো সময়ই তাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেব না।

কথাটা বলা যত সহজ, বাস্তবে করা ততই কঠিন। এর জন্য রীতিমতো অনুশীলন ও অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়; কিন্তু অনুশীলন ও অভ্যাসের জন্য যে নির্দেশনা দরকার তা কোথায় ও কীভাবে পাওয়া যাবে, সে প্রশ্নটিই প্রধান। এত বড় একটা বিষয় নিয়ে বহু বছর চিন্তা-ভাবনা করেও কোনো কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। মনকে অনুগত করার চেয়ে কঠিন কাজ আর নেই। যে কাজ দেব তা-ই তাকে করতে হবে, আর কোনো কাজ করতে দেব না– এমন কর্তৃত্ব মনের উপর হাসিল করা অসাধ্য ব্যাপার। মনকে সব সময়ই ইতিবাচক কাজ দেওয়ার সাধ্য কার? ২৪ ঘণ্টার জন্য এ বিষয়ে রুটিন তৈরি করে সে অনুযায়ী মনকে পরিচালনা করা চরম দুঃসাধ্য সাধনা বলেই আমার অভিজ্ঞতা।

মন কী চায়?

মানবসত্তা বড় বিচিত্র। অনেক সময় মন এমন কিছু পেতে চায়, যা বিবেক সমর্থন করে না। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানবসত্তা একক নয়। মানুষের দুটি সত্তা রয়েছে– দেহসত্তা ও নৈতিক সত্তা। দেহ হলো বস্তুসত্তা। দুনিয়াটাও বস্তুসত্তা। বস্তুজগতের কতক উপাদানেই মানবদেহ গঠিত। তাই বস্তুজগতের প্রতি মানবদেহের প্রবল আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। এ পৃথিবীতে ভোগ করার মতো যাকিছু আছে তা-ই দেহ পেতে চায়। দেহের মুখপাত্রই হলো মন। দেহ যা চায় তা-ই মনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সুতরাং বোঝা যায়, মন যা চায় তা দেহেরই দাবি।

কুরআন মাজীদে দেহের দাবির নাম দেওয়া হয়েছে 'নাফস'। নাফস মানে দেহের দাবি। নাফসের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ -

'নিশ্চয়ই নাফস মন্দের দিকে প্ররোচনা দেয়।' (সূরা ইউসুফ : ৫৩)

অর্থাৎ, দেহের যেহেতু কোনো নৈতিক চেতনা নেই, সেহেতু সে দাবি জানানোর সময় দাবিটি উচিত কি অনুচিত, তা বিবেচনা করতে পারে না। তাই এটা নিশ্চিতভাবে ধরেই নিতে হবে যে, দেহের সব দাবিই মন্দ। অবশ্য বিবেক যদি দেহের কোনো কোনো দাবিকে মন্দ নয় বলে স্বীকার করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

ভালো-মন্দের বিচার কে করবে?

মানুষের বিবেক বা নৈতিক সত্তাই দেহের দাবি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে। এ বিবেকই হলো আসল মানুষ। কুরআনের ভাষায় একেই বলা হয় 'রূহ'। দেহ হলো বস্তুগত হাতিয়ার, যা মানুষকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে। এ বস্তুজগৎকে কাজে লাগানোর জন্য বস্তুগত হাতিয়ারই জরুরি; কিন্তু হাতিয়ারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে উদ্দেশ্য সফল হয় না।

দেহকে হাদীসে ঘোড়ার সাথে তুলনা করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, আরোহী যদি ঘোড়াকে লাগাম কষে চালাতে পারে তবেই ঘোড়া থেকে সঠিক খেদমত পাওয়া সম্ভব। এ যোগ্যতা না থাকলে ঘোড়া যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে গিয়েই আরোহীকে ফেলে দিতে পারে।

দেহ হাজারো দাবি করতে পারে; কিন্তু তাকে কষে লাগাম লাগানোর যোগ্যতা যদি রূহ বা বিবেকের থাকে, তবে এ দেহরূপী ঘোড়াই দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে। ঘোড়াকে বাদ দিয়ে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ভালোভাবে ঘোড়ার যত্ন নিতে হবে, ওকে সুস্থ ও সবল রাখতে হবে; কিন্তু এ দেহরূপী ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা না থাকলে আরোহীর জীবনই ব্যর্থ।

মনের উপর লাগাম লাগানোর উপায় কী?

এ বিষয়ে ইতঃপূর্বেই মন্তব্য করেছি যে, বহু বছর চিন্তা করেও কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। কেমন করে কূল-কিনারা পাব? এ সমস্যা সমাধানের জন্য যে আল্লাহর রাসূল প্রয়োজন। যে সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ্ তাআলা রাসূল পাঠানোর প্রয়োজন মনে করেছেন, সে সমস্যার আর কে সমাধান করতে পারে? দেহযন্ত্র যে আল্লাহ তৈরি করেছেন তিনিই এর ব্যবহারপদ্ধতি রাসূলের

মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মনের উপর লাগাম লাগানোর ইচ্ছা কারো থাকলে রাসূল (স)-এর কাছ থেকেই শিখতে হবে। এর অন্য কোনো বিকল্প নেই।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু মনীষী তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-সংগঠক, সমাজসেবক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন তারাও মনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব কোনো উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। কারণ, এ কাজটির জন্য গবেষণা ও সাধনা যথেষ্ট নয়। এর জন্য রিসালাত ও নবুওয়াত প্রয়োজন। নবী-রাসূলগণ যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা তাদের সাধনা ও গবেষণার ফসল নয়; তা আল্লাহর দান, যা তিনি নবী-রাসূলগণকেই দিয়ে থাকেন।

নবী-রাসূলগণের বাস্তব শিক্ষার নাগাল না পেয়ে যারা এ সমস্যার সমাধানে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তারা বৈরাগ্যের মাঝেই এর একমাত্র সমাধান তালাশ করেছেন; কিন্তু এটা তো আসলে কোনো সমাধানই নয়। তারা দেহের দাবিকে অস্বীকার করে মনকে মেরেই ফেলেন। মরা ঘোড়া কি কাজে আসবে?

নবী-রাসূলগণ মানুষকে বৈরাগী বানাতে আসেননি। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, 'গোটা বস্তুজগৎকে তিনি মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন' (সূরা বাকারা ২৯)। আর এ জগৎকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই মানুষকে দেহযন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে। বৈরাগ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। রাসূলগণ মানুষকে এ বস্তুজগৎ ও দেহযন্ত্রকে আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় ব্যবহার করার পদ্ধতিই শিক্ষা দিয়েছেন। এ শিক্ষা সকল মানুষের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। তাঁরা কোনো অবাস্তব শিক্ষা দেননি।

বিভিন্ন ধর্মের একনিষ্ঠ সাধকগণ বৈরাগ্য সাধনের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দেহকে বস্তুজগতের সকল প্রকার ভোগ থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া আত্মার বা নৈতিকতার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তারা কেবল দুনিয়ার সকল আকর্ষণ পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব মনে করেন। এ অবাস্তব পদ্ধতি গুটিকতক লোক গ্রহণ করতে পারে। এটা মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসার বিদ্রোহ মাত্র।

তারা ধরেই নিয়েছেন যে, বিবাহিত জীবনের স্বাদ ভোগ করে মনকে পরনারীর লোভ থেকে রক্ষা করা অসম্ভব। সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে হারাম কামাই থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাদের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা অস্বীকার করার মতো নয়। রাসূলের শিক্ষা গ্রহণ করার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তাদের পক্ষে পবিত্র জীবন লাভের উদ্দেশ্যে বৈরাগ্য সাধনের পথ বেছে নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই বৈরাগ্য সাধকদের প্রতি আমি অশ্রদ্ধা পোষণ করি না। রূপ, রস, গন্ধেভরা

দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগ করা কোনো খেলা নয়। অন্য একটি প্রবল আকর্ষণ না থাকলে দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগ করা সম্ভব হতো না। অবশ্য এ পথ মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মুসলিম ধর্মসাধকদের মধ্যেও এ প্রবণতা বিভিন্নরূপে লক্ষ করা যায়। রাসূল (স) দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েমের যে আদর্শ রেখে গেছেন, সে কঠিন পথ ত্যাগ করে এবং বাতিল শক্তির সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে আল্লাহর ওলী হওয়ার সাধনা যারা করেন তাদের পথ আর যাই হোক, রাসূলের সত্যিকার অনুসরণ নয়।

রাসূলগণের শেখানো পথ

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মধ্যে এ যোগ্যতা দান করেছেন যে, সে জীবনের জন্য যখন কোনো একটা লক্ষ্য স্থির করে নেয়, তখন ঐ লক্ষ্য হাসিলের জন্য যত শ্রম, সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রয়োজন তা সে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে। এ যোগ্যতা না থাকলে মানুষ জীবনসংগ্রামের কোনো স্তরই অতিক্রম করতে পারত না। স্বাধীনতা সংগ্রামে দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা ভোগ করা, এমনকি মৃত্যুর পরওয়া পর্যন্ত না করা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় সকল আরামকে হারাম করে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা, বড় ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য রাত-দিন এক করে কঠোর পরিশ্রম করা ইত্যাদি এ কথাই প্রমাণ করে যে, লক্ষ্য স্থির করার সিদ্ধান্ত নিলে তা হাসিল করতে সব রকম কষ্ট বরণ করাই সম্ভব।

আল্লাহর রাসূলগণ তাই প্রথমেই গোড়ায় হাত দিয়েছেন। মানুষকে তার জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ডাক দিয়েই তারা কাজ শুরু করেছেন। কুরআন মাজীদের কয়েকটি সূরা, বিশেষ করে সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে বেশ কয়েকজন রাসূলের নাম উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক রাসূল মানবসমাজকে একই কথা কবুল করার দাওয়াত দিয়েছেন। সে কথাটি হলো–

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۔

'হে আমার কাওম! একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চল। কারণ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ হুকুমকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়।' এ দাওয়াতই হলো তাওহীদের দাওয়াত।

এ ডাকে তারাই সাড়া দিয়েছেন, যারা আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা মেনে চলার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যারা রাসূলগণের এ প্রথম দফা দাওয়াত কবুল করেছেন তাদেরকে যে দ্বিতীয় দফা দাওয়াত দেয়া হয়েছে বিভিন্ন সূরায় তারও উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে সূরা

গুআরায় বিভিন্ন নবীর নাম উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, সকল নবীই একই দাওয়াত দিয়েছেন। এ দ্বিতীয় দফা দাওয়াতের ভাষা হলো–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ -

'আল্লাহকে ভয় করে তিনি যা অপছন্দ করেন তা থেকে বেঁচে থেকো এবং আমাকে মেনে চল।'

দ্বিতীয় দফা দাওয়াতের মাধ্যমে রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্য ঐসব লোককে নির্দেশ দেওয়া হলো, যারা তাওহীদকে কবুল করে নিয়েছে। এ দ্বিতীয় দফা দাওয়াতটি হলো রিসালাতের দাওয়াত। যে রিসালাতকে কবুল করল সে এ সিদ্ধান্তই নিল যে, 'আমি আল্লাহর হুকুম একমাত্র রাসূল থেকেই জেনে নেব এবং তিনি যেভাবে ঐ হুকুম পালন করা শিক্ষা দেন একমাত্র ঐ তরীকাই মেনে চলব। আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য রাসূল ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে ভিন্ন কোনো তরীকা গ্রহণ করব না।'

যারা তাওহীদ ও রিসালাতকে কবুল করে নিল তাদেরকে সংগঠিত করে রাসূল (স) এ দুটো দাওয়াত জনগণের মধ্যে প্রসারিত করতে লাগলেন। রাসূল (স) নিজে এবং যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করলেন তারা সবাই রাসূলের নেতৃত্বে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াতকে একটি আন্দোলনে রূপ দান করলেন। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো সমাজে আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাসূলের নেতৃত্ব কায়েম করা। অর্থাৎ, দেশ ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব এমন লোকদের হাতে আনা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর মর্জিমতো দেশকে চালাবে।

যারা এভাবে রাসূলের নেতৃত্বে সংগঠিত হতে রাজি হলেন তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, এ পথে সংগ্রাম করার আসল উদ্দেশ্য হলো আখিরাতের সাফল্য। দুনিয়ার সাফল্য আসল টার্গেট নয়। আখিরাতের টার্গেটকে সামনে রেখে যারা এ পথে চলবেন, একমাত্র তাদের উপরই আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং পরকালে তারাই বেহেশতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি লাভ করতে পারবেন।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতই হলো রাসূলগণের মূল দাওয়াত। মানবসমাজ এর ভিত্তিতে পরিচালিত হলেই মানুষ দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তর ও পর্যায়ে যারা আগে থেকেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দখল করে আছে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত দেওয়া হলো। কারণ, তারা এ দাওয়াত কবুল করলে সমাজে বিনাবাধায় রাসূলের দেখানো পথে চলতে পারবে। সব যুগেই নবীগণ নেতৃস্থানীয়দেরকে এ উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে দাওয়াত দিয়েছেন।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, নেতৃত্বের অধিকারীরা এ দাওয়াত কবুল করতে রাজি হয়নি বলে তাদের সাথে নবীদের সর্বাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে। নবী ও তাঁর সাথীদের উপর হাজারো রকমের নির্যাতন চালানো হয়েছে। হক ও বাতিলের এ সংঘর্ষের মাধ্যমেই ইসলামী আন্দোলনে শরীক জনশক্তির মধ্যে সেই প্রয়োজনীয় গুণাবলি সৃষ্টি হয়েছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন।

একটু ভেবে দেখুন

নবী-রাসূলগণের দাওয়াত কবুল করে ঐ পদ্ধতিতে যারা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং বাতিল শক্তির মোকাবিলায় সদা সতর্ক থাকতে বাধ্য হন, তাদের মন স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন চিন্তার জন্য কমই খালি থাকে। ইসলামী আন্দোলনের দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের ২৪ ঘণ্টার রুটিন প্রণয়ন করতে হয়। নিজেদের জীবনকে এভাবেই আল্লহর সৈনিক হিসেবে তারা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এর ফাঁকেই পারিবারিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। পেশার ঝামেলা তো আছে— বাতিল শক্তির সৃষ্ট বাধা-বিপত্তির প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আন্দোলন হঠাৎ করেই যেসব কর্মসূচি ঘোষণা করে তার জন্য জরুরি ভিত্তিতে শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাদের মনে বাজে চিন্তা ঢোকার অবকাশ কোথায়? যে পথে চলার সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন তা তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

যারা আন্দোলনে শরীক নয়, তাদের পক্ষে আল্লাহর পথের এ মুজাহিদদের দৈহিক ও মানসিক ব্যস্ততা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কঠিন। মুজাহিদদের মনে কুচিন্তা, বাজে খেয়াল, ভিন্ন ভাব ঢোকানোর জন্য ইবলিসের পক্ষে তেমন সুযোগ পাওয়ার কথা নয়।

তবু অনৈসলামী সমাজব্যবস্থার দরুন তাদের ঈমান, আকীদা, রুচি ও পছন্দের বিরোধী পরিবেশে তাদের মনকে পবিত্র রাখার জন্য সদা সতর্ক থাকতে হয়। পরিবারে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, পথে-ঘাটে, যানবাহনে, হাটে-বাজারে তাদেরকে বিপরীত পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। অন্য দশ জনের মতোই রক্ত-মাংসে গড়া দেহের দাবি তাদেরকেও তাড়া করা স্বাভাবিক। তাই এসব অবস্থায় মনকে পবিত্র রাখার জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

এখানে কবি রবীন্দ্রনাথের 'জুতা-আবিষ্কার' নামক কবিতাটি থেকে চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। এক রাজা তার রাজ্যের ধুলাবালি থেকে পা দুটোকে রক্ষা

করার জন্য রাজদরবারে পরামর্শ চাইলেন। চামড়া দিয়ে সব রাস্তা-ঘাট ঢেকে দেওয়ার পরামর্শসহ বিভিন্ন রকম মতামত প্রকাশ করা হয়। অবশেষে এক বৃদ্ধ বললেন, শুধু পা দুটোকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দিলেই যথেষ্ট। এভাবেই জুতা আবিষ্কার করা হয় বলে ঐ কবিতায় একটা রূপক গল্পের অবতারণা করা হয়েছে।

সমাজের সর্বত্র যে অপবিত্রতা বিরাজ করছে তা থেকে মনকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পবিত্রতার চামড়া দিয়ে মনের জন্য মোড়ক তৈরি করাই একমাত্র উপায়। এ ব্যাপারে রাসূল (স) নিম্নরূপ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, যা সত্যিই অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক।

মনকে বশে আনার উপায়

১. **পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতে নামায আদায় করা :** দিন-রাতের ২৪ ঘণ্টার যাবতীয় কার্যক্রম নামাযকে কেন্দ্র করে রচনা করা। ফজরের নামায দিয়ে রুটিন শুরু। এর আগে অন্য কোনো কাজ নয়। টয়লেট, ওযূ-গোসল তো নামাযেরই প্রস্তুতি।

কালেমা তাইয়েবার মাধ্যমে জীবনের যে পলিসি ঠিক করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত। নামায এ সিদ্ধান্ত অনুসারে চলারই ট্রেনিং। মন-মগজ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নামাযে যাকিছু করা হয় তা সবই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী। এর অন্যথা হলে নামায বাতিল বলে গণ্য হয়। নামাযের মাধ্যমে প্রধানত তিনটি শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা–

ক. তুমি আল্লাহর গোলাম হিসেবে সব সময় সর্বাবস্থায় জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তাই নামাযে যেভাবে তোমার মন-মগজ, দেহ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকায় পরিচালনা করেছ নামাযের বাইরেও সেভাবে চলতে হবে।

খ. তুমি যে আল্লাহর দাস, সে কথা হামেশা মনে রাখার প্রয়োজনেই নামায আদায় করতে হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ 'আমার কথা স্মরণ রাখার জন্য নামায কায়েম কর।' (সূরা ত্বা-হা : ১৪)

নামাযশেষে হালাল রোজগারের জন্য যখন তুমি কর্মব্যস্ত হবে, তখন আল্লাহকে ভুলে যাবে না; বরং وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا অর্থাৎ, 'আরো বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক।' (সূরা জুমুআ : ১০)

আল্লাহকে স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যেই ২৪ ঘণ্টার কার্যক্রমে প্রতিটি ফরয নামায জামাআতে আদায় করতে হবে। এ জন্য বাইরে কর্মব্যস্ত থাকাকালেও মনটাকে

মসজিদেই ঝুলিয়ে রাখতে হবে। হাদীসে আছে, ৭ ব্যক্তি হাশরের ময়দানে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকবে। তাদের একজন হলো–

رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ ـ

'ঐ ব্যক্তি, যার মন মসজিদে ঝুলন্ত'। অর্থাৎ, শত কাজের ঝামেলার মধ্যেও মসজিদে জামাআতে ফরয নামায আদায়ের নেশায় লেগে থাকতে হবে। এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতে আদায়কৃত নামায তার মনে আল্লাহর যিকর তাজা রাখে। নামায তাকে আল্লাহকে ভুলতে দেয় না– এটাই হাদীসের অভিব্যক্তি।

নামাযে মনকে আটকে রাখার চেষ্টা করতে থাকাই আমাদের কর্তব্য। বারবার মনোযোগ ছুটে গেলেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ইচ্ছা করে অন্য চিন্তা না করলে এবং মনোযোগকে ধরে রাখার সাধ্যমতো চেষ্টা করতে থাকলে আশা করা যায় যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগ ছুটে গেলেও আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করবেন। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না।

গ. নামাযের তৃতীয় বড় শিক্ষা হলো, অশ্লীল ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করা। কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও হারাম কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।' (সূরা 'আনকাবূত : ৪৫)

নামাযীকে তাই সব সময় সচেতন থাকতে হয় যে, অশ্লীল ও হারাম কাজ যেন হয়ে না যায়, তাহলে তো আল্লাহ্ তার নামায কবুল করবেন না। ঐ নামাযই আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার যোগ্য, যে নামায অশ্লীল ও হারাম কাজ থেকে ফেরাতে পারে। উপরের আয়াতে এ কথাই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيْلًا ـ

'আসলে রাতে জাগা নাফসকে দমন করার জন্য খুব বেশি ফলদায়ক এবং কুরআন ঠিকমতো পড়ার জন্য বেশি উপযোগী।' (সূরা মুয্যাম্মিল : ৬)

তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মহব্বতের যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে, এর কোনো বিকল্প নেই। এ মহব্বতের হাতিয়ারই মনকে ইবলিসের হামলা থেকে রক্ষা করতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ঘুমের মজা ত্যাগ করে যে ব্যক্তি মনিবের দুয়ারে ধরনা দেয়, তার মনে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায়। রাসূল (স) তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 'এটা সালেহ্ লোকদের তরীকা, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়, অতীত-গুনাহ্র কাফ্ফারা ও ভবিষ্যৎ-গুনাহ্র নিরাপত্তা।'

তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের ফাঁকে ফাঁকে বা শেষে নিজের গুনাহ্ মাফের জন্য তাওবা করলে চোখের পানির বৃষ্টিতে মনের আকাশে জমাট গুনাহ্র মেঘ কেটে যায় এবং ঈমানের সূর্য আগের চেয়েও উজ্জ্বল হয়। আল্লাহ্র দরবারে কাঁদতে পারার স্বাদই আলাদা। তাওবার পর মনিবের কাছে চাওয়ার পালা। দীন ও দুনিয়া এবং আখিরাতের সব কিছুই চাইতে হবে। বিশেষ করে মা'বূদের নিকট গোলাম হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করে কাঁদতে আরো মজা লাগে।

৩. রমযানের রোযা ও প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা : শাওয়াল মাসে এ তিনটি ছাড়া আরো তিনটি রোযা তথা আশুরার দুটি এবং আরাফার দিনের রোযা সারা বছর রোযাদারকে নাফসের উপর নিয়ন্ত্রণের যোগ্য বানায়।

৪. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখা : এর জন্য রাসূল (স) যে সহজ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো, প্রত্যেক অবস্থায় এর উপযোগী দু'আ পড়া। রাসূল (স)-এর শেখানো আরবী দোআ অর্থসহ্ শিখতে পারলে তো কোনো কথাই নেই। অন্তত দু'আর অর্থটুকু মনে জাগরূক রাখা দরকার। ঘুমানোর আগে ও ঘুম থেকে জাগার সময়, টয়লেটে যাওয়ার পূর্বে ও ফিরে আসার সময়, ওযূর শুরু ও শেষে, খাওয়ার শুরু ও শেষে, বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর ও বাড়িতে ফিরে আসার সময়, বাজারে চলার সময়, যানবাহনে উঠা ও নামার সময় ইত্যাদি সর্বাবস্থায়ই রাসূল (স) দোআ পড়তেন।

৫. জিহ্বাকে যিকরে ব্যস্ত রাখা : রাসূল (স) মনকে সব সময় আল্লাহ্র যিকরে (স্মরণে) মশগুল রাখার উপায় হিসেবে জিহ্বাকেও যিকরে ব্যস্ত রাখার উপদেশ দিয়েছেন। যখনই ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা থেকে মনটা খালি হয়ে যায়, তখনই তিন তাসবীহ্, কালেমা তাইয়েবা, দরূদ ইত্যাদি মুখে জারি করার সাথে সাথে মনেও সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এভাবে মনকে সব সময় কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে। শয়তান থেকে মনকে বাঁচানোর জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

মুখ ও মনকে একসাথে কাজ দিতে হবে

এ তিক্ত অভিজ্ঞতা সবারই আছে যে, নামায পড়া, তাসবীহ্ জপা এবং যিকর করার সময় মুখে ঠিকই উচ্চারণ করা হচ্ছে; কিন্তু মনে অন্য কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। দেহ জায়নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা পড়ছে, আর মন কোথায় ছোটাছুটি করছে। মুখে তাসবীহ্ উচ্চারণ করা হচ্ছে এবং হাতের আঙুলও তাসবীহ্ দানা টেনে নিচ্ছে বটে; কিন্তু মন অন্য বিষয় ভেবে চলেছে।

অথচ বক্তৃতা করার সময় মুখ যা বলছে মনও তা-ই বলছে। বই পড়ার সময় মুখ ও মন একসাথেই চলে। কারো বক্তৃতা বা কথা শোনার সময় মন দিয়েই শোনা হয়। এই যে এখন আমি লিখছি, মন দিয়েই লিখছি। মন যা লিখতে বলছে তা-ই লিখছি। এসব ব্যাপারে মনোযোগ ঠিকই থাকে; কিন্তু নামায, তাসবীহ্, যিকরের বেলায় মন বিয়োগ হয়ে যায় কেন?

এটা আমাদের শিক্ষার ত্রুটি। নামাযে যা যা মুখে পড়তে হয় তা শেখানোর সময় মনে কী ভাবতে হবে, সে কথা শেখানো হয় না। মুখে যা পড়া হয়, এর অর্থ জানা থাকা সত্ত্বেও মনোযোগের অভাব হতে পারে ঐ শিক্ষার ত্রুটির কারণেই। তেমনি তাসবীহ্ ও যিকরের ব্যাপারে মুখ ও মনকে একই সাথে চলতে হবে। মুখে যা উচ্চারণ করা হচ্ছে, মনে এর ভাব জাগরূক থাকতে হবে। নইলে নামায, তাসবীহ্ ও যিকর প্রাণহীন হয়ে থাকবে। মৃত নামায দ্বারা উপরে বর্ণিত শিক্ষা লাভ হতে পারে না।

মুখে যা উচ্চারণ করা হয়, তা মনকে দিয়েও বলানোর পদ্ধতি সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রয়োজন। মুখে যা পড়া হয়, এর অর্থের দিকে খেয়াল রাখলে মনে অন্য ভাব জাগার পথ পায় না; কিন্তু এ খেয়াল স্থায়ী রাখা কঠিন। এর জন্য মনের আবেগ যোগ হওয়া বিশেষ জরুরি। রাসূল (স) ইবাদতের সময় 'ইহ্সান'-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা-ই আবেগের ভিত্তি। তিনি ইহ্সানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখতে পাচ্ছ। যদি এমনটা না-ও পার, তাহলে অন্তত খেয়াল কর যে, তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।'

এ আবেগ সৃষ্টির প্রয়োজনেই নামাযের শুরুতে তাওয়াজ্জুহ্ (ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু... মুশরিকীন) পড়া হয়। পড়ার সময় মনে এ ভাব জাগ্রত করতে হবে যে, আমার মা'বুদ আমার সামনেই হাজির আছেন। সিজদায় মুখে যখন বলা হয়, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' তখন এর অর্থের দিকে খেয়াল করলে আবেগ সৃষ্টি হবে যে, আমি তো আমার মহান রবের কোলেই আশ্রয় পেলাম। এভাবে নামাযের প্রতিটি

অংশে আবেগ যুক্ত হলে মন নামাযের বাইরে ছোটাছুটি করার ফুরসতই পাবে না।

এমন নামাযই জীবন্ত। জীবন্ত নামাযই মুমিনের জীবন গড়ার যোগ্যতা রাখে। শুধু অনুষ্ঠান হিসেবে নামায আদায় করা হলে তা দ্বারা নামাযের কোনো উপকারই পাওয়া সম্ভব নয়। অনেকের জীবনে এ কারণেই নামাযের উদ্দেশ্য সফল হতে দেখা যায় না।

রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক নেক আমলের কমপক্ষে ১০ গুণ এবং বেশি পক্ষে ৭০০ গুণ বদলা দেবেন। একই জামাআতে নামায আদায় করেও কেউ ১০, কেউ ৫০, কেউ ১০০, কেউ ৭০০ গুণ সওয়াব পাওয়ার কারণ কী? একই কাজের মজুরি এত বেশি-কম করে কেন দেওয়া হবে? নামাযে কে কতটা মনকে হাজির রাখতে সক্ষম হলো, কার জযবা ও আবেগ কী পরিমাণ ছিল, কে কতটা মহব্বতের সাথে মনিবের নিকট নিজেকে সমর্পণ করল ইত্যাদির তারতম্যের ভিত্তিতে পুরস্কারের পরিমাণ কম-বেশি হবে।

নামায, তাসবীহ্ ও যিকরের ব্যাপারে কমপক্ষে একটু চেষ্টা করতে হবে যে, মুখে যখন উচ্চারণ করা হয়, তখন যেন তা মনের অগোচরে না হয়। মনের দিকে খেয়াল রেখেই মুখে পড়তে হবে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, বুকের বাম পাশে যেখানে হার্ট বা হৃদ্‌পিণ্ড থাকে, সেদিকে খেয়াল রেখে ধীরে ধীরে মুখে পড়তে থাকলে মনকে নামাযের মধ্যেই আটকে রাখা সহজ হয়। এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, মনকে নামাযের বাইরে যেতে দেব না।

আমার এ অভিজ্ঞতার ভিত্তি হলো সুফী-সাধকদের 'কালবী যিকর' সম্পর্কে ধারণা। তাঁরা কালবের অবস্থান বুকের বাম দিকেই নির্ধারণ করেন। মুখে যেমন 'আল্লাহ্' উচ্চারণ করেন তেমনি তাঁরা কালবেও উচ্চারণ করার অনুশীলন করে থাকেন। এমনকি সেখান থেকে এ উচ্চারণের আওয়াজও বের হয়। এটা তো দীর্ঘ অনুশীলনের বিষয়। রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামকে এ অনুশীলনের শিক্ষা দিয়েছেন বলে আমি এখনো জানতে পারিনি; কিন্তু কালবে উচ্চারণ না করেও কালবের দিকে খেয়াল রেখে মুখে উচ্চারণ করলে যে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ খেয়াল যত গভীর হয়, মনোযোগ ততই মযবুত হয়। গভীর মনোযোগকেই সুফীগণ 'মুরাকাবাহ্' বলেন।

কুচিন্তা ও সুচিন্তা

আগেও বলা হয়েছে যে, দেহের দাবিতে মনে কুচিন্তা জন্মে; কিন্তু বিবেক তা সমর্থন করে না। যারা নৈতিকতার ধার ধারে না তাদের বিবেক দুর্বল। তারা

ইচ্ছা করেই কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়। মনের পবিত্রতার কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

যারা সুচিন্তা করা পছন্দ করে, শয়তান তাদের মনেও সময় সময় মানবীয় দুর্বল মুহূর্তে কুচিন্তা ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু যারা আল্লাহর দাস হিসেবে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা অবশ্যই কুচিন্তাকে মন থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করে। কোনো সময় যদি ঐ কুচিন্তা মন্দ বিষয়ে লিপ্ত করেই ফেলে তখন তারা অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে। তারা স্থায়ীভাবে নাফসের নিকট আত্মসমর্পণ করে না।

যারা সুচিন্তায় অভ্যস্ত তাদেরকে নামাযের সময় ইবলিস নামাযের বাইরের কোনো সুচিন্তা মনে ঢুকিয়ে হলেও নামায থেকে অমনোযোগী করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই নামাযে যে চিন্তা মনে জারি থাকা দরকার তাতেই একাগ্র হতে হবে। নামাযের বাইরের কোনো ভালো চিন্তাকেও প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। সাধারণত করণীয় বিভিন্ন কাজের ব্যাপারে ভালো চিন্তা এসে নামাযের চিন্তাকে সরিয়ে দেয়; কিন্তু বাইরের সুচিন্তাও জীবন্ত নামাযের জন্য ক্ষতিকর।। নামাযে শুধু নামাযের চিন্তাই থাকা উচিত।

দুশ্চিন্তা

কোনো মানুষই দাবি করে বলতে পারে না যে, তার জীবনে সমস্যা নেই। সম্পূর্ণ রোগহীন দেহ ও সমস্যামুক্ত জীবন অবাস্তব। জীবনে আপদ, বিপদ ও সমস্যার অন্ত নেই। জীবনের আরেক নামই সমস্যা। জীবনসংগ্রাম মানেই হলো জীবনসমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো। সমস্যা আছে এবং থাকবে জেনেই সমাধানের চেষ্টা চালাতে হয়।

দুশ্চিন্তা কাকে বলে? দুঃখ-দৈন্য, আপদ-বিপদ ও দুর্ঘটনার ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা থেকে উদ্ধারের পথ পাওয়ার জন্য যে পেরেশানি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, এরই নাম 'দুশ্চিন্তা'। 'হায় আমার কী হবে? বাঁচার কোনো উপায়ই দেখছি না। এর পরিণতি কী হবে?' এ জাতীয় চিন্তাকেই দুশ্চিন্তা বলে। দুশ্চিন্তা এমন এক রোগ যে, একে প্রশ্রয় দিলে চরম হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। হতাশার চরম পর্যায়ে মানুষ আত্মহত্যা করার মতো চরম দুর্বলতাও প্রদর্শন করে বসে।

দুশ্চিন্তা কিন্তু সমস্যার সমাধানে সামান্য সাহায্যও করে না; বরং সমস্যাকে আরো জটিল করে। ধীরচিত্তে ও স্থির মস্তিষ্কে সমাধান তালাশ করতে হয়। অস্থির চিত্ত কখনো সমাধান খুঁজে পায় না। দুশ্চিন্তা চিন্তার ভারসাম্য বিনষ্ট করে বলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমনকি এ রোগ সমাধানের কোনো নির্দিষ্ট পথকেই

চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে দেয় না। একেক বার একেক রকম পথ ধরার চেষ্টা করে বলে ব্যক্তি ধৈর্যের সাথে কোনো পথে চলতে সক্ষম হয় না। তাই দুশ্চিন্তা হলো চিন্তার বিকৃতি।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাহদেরকে দুশ্চিন্তার মুসীবত থেকে রক্ষার জন্য এমন কতক মূলনীতির কথা ঘোষণা করেছেন, যা মেনে নিলে শত মুসীবতেও মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলা সম্ভব।

১. কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ـ

'আল্লাহর বিনা অনুমতিতে কোনো মুসীবত আসে না। যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তার কালবকে হেদায়াত দান করেন।' (সূরা তাগাবুন : ১১)

ব্যাপারটি এমন নয় যে, কোনো বিপদ আল্লাহ্ ঠেকাতে পারলেন না বলে এসে গেল; বরং আল্লাহ বিপদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেই তা আসে। যদি কেউ এ কথা বিশ্বাস করে তাহলে সে অস্থির না হয়ে ধৈর্যধারণ করবে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারেই ধরনা দেবে। আল্লাহর প্রতি সঠিক আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে বিপদের সময় কেমন আচরণ করতে হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সঠিক হেদায়াত দান করেন।

মুসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করাও কর্তব্য। শান্ত মনে ভেবে-চিন্তে চেষ্টা-তদবীর করতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে যাতে তদবির করা যায়, সে জন্য কাতরভাবে দু'আও করতে হবে। কোনো তদবির ফলপ্রসূ না হলেও হতাশ না হয়ে মহা ন মনিবের নিকটই সঠিক পথ চাইতে হবে।

২. আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন,

اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ـ

'হে রাসূল! আল্লাহ্ যদি আপনার উপর কোনো মুসীবত দেন তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার ক্ষমতা অন্য কোরো নেই।' (সূরা ইউনুস : ১০৭)

যত চেষ্টা-তদবিরই করা হোক, মুসীবত থেকে উদ্ধার করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। এ অবস্থায় অস্থির হওয়া, হতাশা প্রকাশ করা বা আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার দ্বারা মানসিক যন্ত্রণা পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো লাভ হয় না।

৩. কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে—

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

'আল্লাহর উপর ভরসা করাই মুমিনদের কর্তব্য'—এ কথাটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে বহু সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাহদেরকে বারবার তাকীদ দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র আমার উপর ভরসা কর। বৈধ পথে চেষ্টা-তদবির অবশ্যই করতে থাক। তবে ঐ তদবিরের উপর আসল ভরসা যেন না হয়। তাহলে হতাশায় ভুগতে বাধ্য হবে।

আসলে আল্লাহর উপর আস্থা রাখাই হলো ভরসা বা তাওয়াক্কুল। মুমিন কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর উপর আস্থা হারায় না। এ আস্থা রাখতেই হবে যে, আমার মেহেরবান আল্লাহ আমার মঙ্গলই করবেন। যদিও আমি বুঝতে পারছি না যে, আমার মুসীবতের মাধ্যমে কী মঙ্গল হতে পারে। তবে এ আস্থা আছে যে, আল্লাহ অমঙ্গল করেন না। বিতরের নামাযের দু'আ কুনূতে এ আস্থার কথাই আমরা প্রতিনিয়ত ঘোষণা করি এ ভাষায়—

وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ.

'হে আল্লাহ! তোমার উপর ঈমান রাখছি, তোমার উপর ভরসা করছি এবং তুমি মঙ্গলময় বলেই আমি প্রশংসা করি।'

অর্থাৎ, তুমি যা কিছুই কর তাতে আমার মঙ্গল হবে বলেই বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাস ছাড়া হতাশার যাতনা থেকে মুক্তির কোনো উপায়ই নেই।

৪. কুরআন মাজীদে আরো বলা হয়েছে—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

'আল্লাহর প্রতি অনুরাগী তারা, যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে থাকে। জেনে রাখ, একমাত্র আল্লাহর যিকরেই অন্তর সান্ত্বনা লাভ করে।' (সূরা রা'দ : ২৮)

হাজারো মুসীবতের মধ্যেও আল্লাহকে ডেকে তাঁর দরবারে ধরনা দিয়ে এবং তাঁর নিকট আশ্রয় চেয়েই মনে প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব। সূরা ফাতিহায় 'একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই' বলার উদ্দেশ্যও তাঁরই আশ্রয় কামনা করা।

ঈমানদারের জন্য দুশ্চিন্তা অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। কারণ, আল্লাহ তাআলা বিপদ-মুসীবত সম্পর্কে কুরআনে যে ধারণা দিয়েছেন তা বিশ্বাস করলে দুশ্চিন্তা

থাকার কথা নয়। ঈমানের দাবিদার হয়েও দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে ঐ ৪টি মূলনীতিকেই অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করা হয়। আর দুশ্চিন্তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে–

১. আমার উপর এই মুসীবত দিয়ে আল্লাহ আমার উপর অবিচার করেছেন। এটা করা মোটেই উচিত হয়নি।

২. এ মুসীবত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আল্লাহর দয়ার অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার নেই। আমাকেই কিছু করতে হবে এবং যেমন করেই হোক, এ থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

৩. এ মুসীবতের মধ্যে আমার জন্য কোনো মঙ্গল থাকতে পারে, তা আমি স্বীকার করি না। যারা আমার এ মুসীবতের জন্য দায়ী তাদেরকে আমি ক্ষমা করব না। সুযোগ পেলেই দেখে নেব।

৪. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেই মনের শান্তি পেতে হবে বলে যা বলা হয় তা কী করে সম্ভব? আমার মনে যাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে তা আমি কেমন করে ভুলব? আর আল্লাহকে এত ডেকেই কী হবে? আল্লাহ তো সাড়া দিচ্ছেন না। আর কত ডাকব?

এভাবে দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে ঈমান হারানোর আশঙ্কা রয়েছে।

তাই দুশ্চিন্তা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর শেখানো নিয়মে মনকে ইতিবাচক কাজ দিন। তাহলে দুশ্চিন্তা মনকে ভারাক্রান্ত করার সুযোগ পাবে না। দুশ্চিন্তা মারাত্মক মানসিক রোগ। এ রোগ একাগ্রচিত্তে কোনো কাজ করতে দেয় না, ঘুমাতে দেয় না, তৃপ্তির সাথে খেতেও দেয় না। ফলে দৈহিক ও স্নায়বিক বিরাট ক্ষতি সাধন করে।

দুশ্চিন্তার ফলে অনেক সময় নিজের উপরই রাগ আসে। মুসীবতের জন্য অন্যদেরকে দায়ী করলে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এমনকি দুশ্চিন্তা আল্লাহর উপরও অসন্তুষ্ট হতে বাধ্য করে। আল্লাহর প্রতি অভিমান বশে আল্লাহকে নির্দেশ দেয় যে, 'হয় এটা কর, না হয় ওটা কর'। এ সবের কোনোটাই সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়।

আল্লাহর উপর পূর্ণ আত্মসমর্পণই দুশ্চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায়। দুশ্চিন্তার মাধ্যমে শয়তান আপনার মনের উপর রাজত্ব করছে। শয়তানকে উৎখাত করে আল্লাহর রাজত্ব মনের মধ্যে কায়েম করুন— মনে শান্তি পাওয়ার এটাই একমাত্র পথ।

মনের সাথে চোখের সম্পর্ক

মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে চোখকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চোখকে ক্যামেরার লেন্সের সাথে তুলনা করলে মনকে ক্যামেরার ফিল্মের সাথে তুলনা করা যায়। ক্যামেরার লেন্স যা দেখে তা-ই ভেতরের ফিল্মে ছবি হয়ে যায়। তেমনি চোখের লেন্স দিয়ে যা দেখা হয় তা-ই মনের ফিল্মে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। তাই মনকে পবিত্র রাখতে হলে অপবিত্র দৃশ্য দেখা থেকে চোখকে ফিরিয়ে রাখতে হবে।

কুরআনে মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরনারীর উপর চোখ পড়ার সাথে সাথে নামিয়ে নিতে হবে এবং আবার দেখা থেকে চোখকে ফেরাতে হবে। যেসব মহিলার সাথে বিয়ে জায়েয নয় তারা ছাড়া অপর মহিলার দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখলে তার ছবি মনে অংকিত হয় এবং সে ছবি মনকে অপবিত্র করতে থাকে।

রাস্তা-ঘাটে বা পত্র-পত্রিকায় নৈতিকতার দৃষ্টিতে আপত্তিকর যত রকম দৃশ্য চোখে পড়ে তার প্রতি মনে ঘৃণা জন্মাতে হবে এবং সেসব থেকে সযত্নে চোখকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। তাহলে মনের পবিত্রতা রক্ষা করা সহজ হবে।

তাসবীহ পড়া বা যিক্‌র করার সময় চোখ বন্ধ রাখলে মনের একাগ্রতা বহাল রাখা সহজে সম্ভব হয়। কারণ, চোখ যা দেখে মনকেও সে তা দেখায়। নামাযে সব সময় চোখ বুজে থাকা মাকরূহ বলে চোখ বন্ধ রাখার ফাঁকে ফাঁকে চোখ খুলতে হবে। মনকে নামাযে নিবদ্ধ করার প্রয়োজনে চোখ বন্ধ রাখা জায়েয। সব সময় চোখ বুজে নামায আদায় করলে চোখের ট্রেনিং হয় না। নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে দেখার বিধান রয়েছে, যাতে চোখকেও আল্লাহর হুকুম এবং রাসূলের তরীকা অনুযায়ী ব্যবহার করার ট্রেনিং হয়। এ ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্য হলো, নামাযের বাইরে চোখকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে চলার যোগ্য বানানো। যাদের নিকট মনের পবিত্রতা রক্ষার গুরুত্ব রয়েছে তাদেরকে চোখের নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে।

মনের অবসর সময়ের কাজ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আপনি যখন কাজ করেন তখন ঐ কাজটি ভালোভাবে সমাধা করার জন্য মনোযোগ দিয়েই কাজটি করতে হয়। অবশ্য এটা কাজের ধরনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কৃষক ও শ্রমিকদেরকে শুধু হাত-পা ব্যবহার করে গতানুগতিক ধরনের এমন কাজও করতে হয়, যে কাজে মনের তেমন কোনো দায়িত্ব থাকে না। রিক্সাওয়ালার দেহ রিক্সা টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় এ কাজে মনের তেমন কোনো দায়িত্ব নেই বলে তখন হাজারো ভাব মনে জাগতে পারে।

কিন্তু হাত যখন কলম দিয়ে লিখে তখন মন এ কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, মুখ যখন বক্তৃতা করে অথবা কান যখন বক্তৃতা শোনে তখন মন এ কাজেই শরীক থাকে।

তাই আপনাকে হিসাব করতে হবে যে, আপনার দেহ যে কাজ করছে সে কাজে মনের দায়িত্ব কতটুকু আছে। যে কাজের সময় মন বেকার থাকে তখন তাকে কাজ দেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে আপনার অজান্তেই ইবলিস তাকে বাজে কাজে বেগার খাটাবে— এটাই মানবজীবনের বিরাট এক সমস্যা। মন অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র। এর যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অসীম। কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও সে থাকতে পারে না। তাকে সব সময়ই কাজ দেওয়ার যোগ্যতা অনেকেরই নেই। ফলে আপনার এ মূল্যবান কর্মচারী ইবলিসের বেগার খাটে।

আপনার দেহ কোথাও বসে বা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বা পায়চারি করে কাটাতে হচ্ছে। একা একা পার্কে বা রাস্তায় ভ্রমণ করছেন। যানবাহনের অপেক্ষায় স্টেশনে বসে বা কিউতে দাঁড়িয়ে আছেন। যানবাহনে চুপচাপ বসে আছেন বা বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দৈহিক পরিশ্রম করার পর ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে বসে বা শুয়ে আছেন, অথবা ঘুমের কামনায় বিছানায় চোখ বুজে পড়ে আছেন— এমন বহু সময় রোজই আমাদের জীবনে কেটে যায়, যখন সচেতনভাবে আমরা মনকে কোনো বিশেষ চিন্তায়-ভাবনায় বা পরিকল্পনা রচনায় ব্যবহার করি না। মনকে আমরা এভাবে যখনই বেকার রেখে দেই তখন সে ইবলিসের বেগার কর্মচারীতে পরিণত হয়।

এর প্রতিকার হিসেবে রাসূল (স) একটি ইতিবাচক ও একটি নেতিবাচক উপদেশ দিয়েছেন। নেতিবাচক উপদেশটির সারমর্ম হলো, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর। মনে এমন ভাব আসতে দিও না, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। আল্লাহ মনের গোপন ভাবও জানেন। তাই এ কথা খেয়াল রাখবে যে, এমন কথা আমি মনে কী করে স্থান দিতে পারি, যা আমার মনিব অপছন্দ করেন? এভাবে লজ্জাবোধ করলে মনকে বাগে রাখা যায়।

আর ইতিবাচক উপদেশ হলো, জিহ্বাকে সব সময় আল্লাহর যিকরে চলমান রাখা। মনে খারাপ ভাব আসতে না দিলে মুখের যিকর মনকে যিকরে মশগুল রাখবে। অর্থাৎ, মন ও মুখ কোনোটাই খালি রাখা নিরাপদ নয়। মুখের যিকর মনকে যিকর করতে সাহায্য করে।

মনকে দেওয়ার মতো কোনো কাজ না থাকলে তাকে যিকরে ব্যস্ত করে দিতে হবে এবং এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মুখের যিকর জারি করা দরকার।

যিকরের ব্যাপারে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হলো, হাদীসের কোথাও শুধু 'আল্লাহু, আল্লাহু' যিকরের শিক্ষা দেওয়া হয়নি। 'আল্লাহ' শব্দের

সাথে আল্লাহর কোনো একটি গুণবাচক বা প্রশংসাসূচক শব্দ থাকা দরকার। যেমন— সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি। বুখারী শরীফের শেষে একটি চমৎকার তাসবীহ শেখানো হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন,

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ وَحَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

"দুটো বাক্য এমন আছে, যা মুখে উচ্চারণ করা খুব সহজ; কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় বেশ ভারী এবং আল্লাহর নিকট বড় প্রিয়। তা হলো, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম'।"

কতক বাস্তব পরামর্শ

খালি মনকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য আমার ব্যক্তিগত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে কতক পরামর্শ পেশ করছি :

১. সব সময় সব অবস্থায় ইসলামী বই সাথে রাখুন; যখনই মন অবসর হয়ে যায়, ঐ বই পড়ুন। এটা যিকর থেকেও বেশি কার্যকর পন্থা। যিকরে মনোযোগের অভাব হতে পারে। পড়ার সময় তা হয় না। তাছাড়া সকল রকম নফল ইবাদতের মধ্যে দীনের ইলম তালাশ করা শ্রেষ্ঠতম।

২ অনেক সময় বই পড়ার পরিবেশ বা সুযোগ থাকে না। তখন নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজ করতে পারেন—

ক. কুরআন মাজীদের মুখস্থ করা সূরাগুলো আওড়াতে থাকুন। পরিবেশ অনুকূল থাকলে গুন্‌গুন্ করেই পড়ুন।

খ. কালেমা তাইয়েবা, তিন তাসবীহ, দরূদ বা যেকোনো যিকর মুখে ও মনে জপতে থাকুন।

গ. আপনার করণীয় কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে চিন্তা করুন। কারো সাথে আলোচনার কথা থাকলে বিষয়টি মনে মনে গুছিয়ে নিন।

ঘ. নিঃশ্বাস টানার সময় চেতনভাবে 'লা ইলাহা' এবং নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় 'ইল্লাল্লাহ' নিঃশব্দে মনে মনে পড়তে থাকুন।

শেষ কথা

হাদীসে আছে যে, বেহেশতবাসীদের একটি আফসোস ছাড়া বেহেশতে আর কোনো মনোবেদনা থাকবে না। দুনিয়াতে যে সময়টা আল্লাহকে ভুলে থেকে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঐ অবহেলার জন্যই তারা আফসোস করতে থাকবে।

বেহেশত তো ঐ চিরস্থায়ী বাসস্থানেরই নাম, যেখানে সামান্য দুঃখ-কষ্ট, অভাব পর্যন্ত থাকবে না। অথচ একটা বিষয়ে আফসোস থেকেই যাবে। আফসোস তো মনোবেদনারই সৃষ্টি করে। এ দুঃখটুকু থেকেই যাবে। সকলের বেলায় তা হয়তো হবে না; কিন্তু যাদের বেলায়ই হোক, এ বেদনাটুকুর অস্তিত্ব সত্য।

এ আফসোসের কারণ তালাশ করলে হাদীসের বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়। আল্লাহর দিদারই বেহেশতের সকল নিয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত বলে বেহেশতবাসীরা মনে করবে। আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে পাওয়ার চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কোনোটাতেই তারা বোধ করবে না। সবাই সমান পরিমাণ সময় আল্লাহকে দেখতে পাবে না। যে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে যত বেশি স্মরণ করেছে সে তত বেশি সময় আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। তাই যারা কম সময় দেখার সুযোগ পাবে তারাই হয়তো ঐ রকম আফসোস করবে।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত যারা নেয় তারা মানবসমাজে আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাসূলের নেতৃত্ব কায়েমের জন্যই সংগ্রাম করে। আর এ সংগ্রামের পরিণামে আখিরাতে সাফল্যের আশা রাখে। এ সিদ্ধান্ত তাদের মন-মগজ, চরিত্রকে এক বিশেষ ছাঁচে গড়ে তোলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়।

যাহোক, আপনি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হোন বা না হোন, আখিরাতে মুক্তির কামনা তো নিশ্চয়ই করেন। তাহলে মনটাকে ইতিবাচক কাজ দিন। মনকে ইবলিসের বেগার কর্মচারী হতে দেবেন না। ইবলিস থেকে মনকে রক্ষা করতে সক্ষম হলে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অনিবার্য।

মনে রাখবেন, ইবলিসের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম মৃত্যু পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এ সংগ্রাম থেকে বিরাম পাওয়ার উপায় নেই। তবে দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে ধীরে ধীরে আল্লাহর মেহেরবানিতে ইবলিসের পরাজয় হওয়া অসম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাআলা ইবলিস সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন,

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ

'শয়তান তোমাদের দুশমন, তাকে দুশমনই মনে করবে।' (সূরা ফাতির : ৬)

আদম (আ) বেহেশতে শয়তানের ধোঁকায় এ কারণেই পড়েছিলেন যে, তিনি শয়তানকে শত্রু মনে করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

সমাপ্ত